চাষবাস পরিবর্তনে আদিম আদিবাসী

Asst. Prof. Anjali Dolai
(Department of Santali)
Government General Degree College , Salboni, Koima , Bhimpur ,
Paschim Medinipur ,Pin- 721516 W.B.

একটি গ্রামে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং চাষযোগ্য জমির অভাব দেখা দিলে আদিবাসীরা বেরিয়ে পড়ত জঙ্গলে আর একটা জায়গার সন্ধানে।জায়গা পছন্দ হলে দিনক্ষন দেখে তাদের রীতি অনুযায়ী আর একটা গ্রাম গড়ে তুলত। গ্রামের সকলে মিলে জঙ্গল হাসিল করত,মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেতি বানাত,ফসল ফলাত , সোনার ফসল খেয়ে পরে রাজা –রানীর মতো থাকত।

বির বারগে নোওয়া ওড়াক কক আলাঙ

রাজারানী ননডে আলাঙ কক আলাঙ

রেঙগেচ জালা দলাঙ এড়ের গিডিয়া

সেরমা রেয়াক সুকলাঙ ভুঞজাউ সুকজঙ আ।

অর্থাৎ - এই বনভূমিতে আমরা ঘরবাড়ি তৈরি করব , রাজারানী হয়ে আমরা থাকব , জগতের দুঃখ কষ্ট আমরা ভুলে যাব ,স্বর্গীয় আনন্দ আমরা উপভোগ করব. (সংগ্রহ ও অনুবাদ – ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে)।

ভারতবর্ষে প্রথম কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করে খেরোয়াল জনগোষ্ঠীর মানুষ। সমভবত যীশু খ্রীষ্টের জনমের ১৫০০ বছর পূর্বে , যে সময়ে বর্বর আর্যজাতি ভারত নামক দেশে আসতে শুরু করে।

খেরোওয়ালী ভাষায় দেড় শতাধিকেরও বেশী জাতের ধানের নাম , কত রকম খাদ্যশস্য যেমন ইড়ি এরাবা , জোনার , বাজরা , জানহে , সায়ো , কদে গুদলি ইত্যাদি ফসলের নাম পাই। তার উপর আছে বনে – জঙ্গলে কত রকমের ফলমূল , শাকপাতা।

প্রকৃতির সাথে খেরোওয়ালদের একটা আত্মিক সম্পর্ক আছে । প্রকৃতিভিত্তিক খেরোয়াল জীবন এবং কৃষিভিত্তিক খেরোয়াল সমাজ। প্রকৃতির রূপ , রঙ এর পরিবর্তনের সাথে সাথে খেরোয়াল মানুষের পালা পার্বন , মনন চিন্হনের পরিবর্তন হয় । আজও অশ্বথ গাছের ডগায় বসে তুৎপাখি জানিয়ে দেয় পৃথিবী ঘুরছে – হেসাক মা চটেরে জা গঁসায় ভুদে দয় রাগে কান..... জা গঁসায়দেস চ নাঁচুরেন , জা গঁসায় দিসম চ বিহুরেন। অরণ্যাসৃত মানুষদের প্রকৃতিই নির্দিষ্ট করে দেয় , কখন , কোন সময় কী শস্য বুনতে হবে । বনে বনে যখন লতানে গাছ সেরকায় থোকা থোকা সাদা সাদা ফুলে ভরে যায় তখন হো সম্প্রদায়ের মানুষেরা

বুঝতে পারেন - গুঁদলি বোনার সময় এসেছে , গাছে গাছে বনকুল যখন পাকতে শুরু করে তখন লাড়কা কোলেরা বেড়া জমিতে হামাল বাবা (ভারী ধান) বুনতে শুরু করেন ।

খেরোওয়ালদের জমি তাদের মা , জঙ্গল তাদের কাকিমা , ফুল উৎসব দিয়ে তাদের বছর শুরু , ফল উৎসব দিয়ে তাদের বছরের সমাপ্তি । জমির সাথে আছে তাদের বংশ পরম্পরাগত আত্মিক বন্ধন ।

প্রায় ৬৪ অব্দে মাদরা মুন্ডার পালিত পুত্র ফনী মুকুট রায়কে মুন্ডারা প্রথমে মহারাজ নির্বাচিত করেন। মুন্ডারা মহারাজার কাছে মানকিদের মারফৎ ইচ্ছামত কিছু নজরানা পাঠাতেন। রাজাও সন্তুষ্ট থাকতেন। কালক্রমে নির্বাচিত রাজার নিকট সকল মুন্ডা , পাহান মানকিরা বশ্যতা স্বীকার করলেন। ধীরে ধীরে রাজা নির্বাচিত হওয়ার বদলে বংশগত রূপ নিল। আড়ম্বরপূর্ণ জীবন শুরু করল।অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের জন্য খাজনা প্রথার প্রবর্তন হলো । বাইরের রাজারা ছোটনাগপুর রাজার কাছে দামী দামী ঘোড়া , শাল ইত্যাদি ভেট পাঠাতে শুরু করল । রাজপুত বংশের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হলো । রাজকার্য পরিচালনার জন্য বিহার ও মধ্যপ্রদেশ থেকে লোক আনানো শুরু হলো । পাহানদের বদলে ব্রাহ্মণদের দিয়ে মুন্ডাদের প্রধান দেবতা সিঞ বোঙগার পূজা অর্চনা করানো হলো। ভিন দেশী কর্মচারীরা জায়গীরদার ঠিকাদার এবং মহাজনে পরিনত হলো। জায়গীরদারেরা অধিক হারে স্থানীয় রায়তদের উপর কর চাপাতে শুরু করল । এদের অত্যাচারে মুন্ডাদের সমাজ জীবনে নেমে এল গভীর দুর্দশা । যারা নির্বাচিত প্রথায় রাজা নির্বাচন করেছিল সেই বিষ বীজ তাদেরকে ধবংসের পথে ঠেলে দিল। গণতন্ত্র বিশ্বাসী মুন্ডারা এই আত্মঘাতী প্রথাকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না । বিপদ বুঝে মহারাজ সৈন্যদল বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হলেন । ভিনদেশি চত্রীক , বরাহক এবং রেতিয়া জাতিভুক্ত লোকেদের সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করা হল। মুন্ডাদের পরম্পরাগত ভূমি সংক্রান্হ নীতি ওলট – পালট হতে শুরু করল ।

ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতবর্ষের কৃষি ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর চরম আঘাত হানে । উৎপন্ন ফসলের বিরাট অংশ শাসক শ্রেণীর ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকদের দিতে হত । বিলাসপ্রিয় ব্রিটিশ এবং সুলতানগণ ভারতবর্ষের কৃষি ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ জর্জরিত করে ফেলেছিল । ছোটনাগপুর পাহাড় জঙ্গলে বসবাসকারী খেরোয়াল গোষঠীর মানুষেরাও মুসলমান শাসকের হাত থেকে রেহাই পায়নি । শেরশাহের আমলে জমি জরিপের কাজ শুরু হয় । ব্রিটিশ আমলেই ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেএে মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হয় । কাউডি ব্যবস্থার রূপান্হর ঘটতে থাকে । তৎসত্ত্বেও ব্রিটিশ যুগে ছোটনাগপুর অঞ্চলে সামগ্রীক আদিবাসী জীবনধার অনেকটাই অক্ষুন্ন ছিল । আগে মোঘল এবং পাঠান সম্রাটরা ছোটনাগপুরের মালভূমিকে বাংলার প্রবেশ দ্বার হিসেবে ব্যবহার করতেন । স্থানীয় আদিবাসী জমিদারদের কোনদিন উৎখাত করার চেষ্টা করেননি । নামমাত্র নজরানা নিয়ে নিজেদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল । ১৭৬৫ সালে বাদশা আলম ইসট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকার মেনে নেয় । ফলে ১৭৬৭ সাল থেকে ইংরেজরা অধিক সংখ্যায় ঝাড়খন্ডে প্রবেশ করতে থাকে। এলাকার সমস্হ রাজাদের উপর বর্ধিত হারে রাজস্ব আদায়ের চাপ দিতে থাকে ।

ইংরেজ সৃষ্ট জমিদার , কালেকটর এবং তাঁবেদারদের দৌরাত্ম্যে ছোটনাগপুর মালভূমিতে বিদ্রহের আগুন জ্বলতে থাকে ।

১৭৬৫ সালে ইসট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করার পরেই ব্রিটিশ সেনা ধীরে ধীরে মেদিনীপুর জেলাকে কেন্দ্র করে ছোটনাগপুর মালভুমি এলাকায় কর্তৃত্ব কায়েম করতে সচেষ্ট হয় । আদিবাসী ও দেশীয় জমিদারদের উচ্ছেদ করে মধ্যবিত্ত বর্ণবাসী ভোগবিলাসী জমিদারদের বসানো শুরু হয় । পাইকান স্বতত বিলোপ করা হয় । যার ফলস্বরূপ সংগঠিত হয় ভূমিজ ও চোয়ার বিদ্রহ । ১৭৬৭ সাল থেকে লাগাতার চুয়াড় আন্দোলন ।

চুয়াড় অর্থাৎ জংলীদের শায়েসতা করতে তৈরী হয়েছিল জঙ্গল মহল ডিসটিক্ট । কিন্তু শায়েসতা তো দূরের কথা দীর্ঘ আঠাশ বছরেও চুয়াড়দের বাগে আনা যায়নি । ১৮৩৩ সালে জঙ্গল মহল জেলাকে আবার বিভক্ত করা হয়েছিল । বড়াম পাহাড় থেকে শুরু করে লাখাইমিনি তেরেলকুটি , সাল রাকাপ , ডোমবারি , কানাইসর , বায়কা , আযোধিয়া বরুতে যখন দাউ দাউ করে বিদ্রহের আগুন জ্বলছিল তখন রাজমহল বুরুর কোলে আর একটা নতুন ইতিহাস শুরু হয়েছিল – দামিন-ই-কোহ ।

জমি এবং জঙ্গলের অধিকার থেকে উচ্ছেদের জন্যই শাল , সেগুন , মহুয়ার জঙ্গলে রাজমহল থেকে ডোমবারি বুরু গুহা কন্দরে বার বার ধবনিত হয়েছে হুল -এর আওয়াজ । ১৮২০সালে হ্যামিলটন মেদিনীপুর জেলার সাঁওতালদের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন এরা ভীষন গরীব , পাশাপাশি হিন্দু চাষীরা এদের মানুষ বলে গণ্য করে না । যদিও এরা সরল , বিনয়ী এবং পরিশ্রমী । এরা জন্তুদের কাছ থেকে ফসল রক্ষা করতে পারলেও মহাজনদের কাছে থেকে তা এরা রক্ষা করতে পারে না । ১৯১০ সালের সমীক্ষায় ম্যাক আলপিন দেখিয়েছেন – মেদিনীপুর , বাঁকুড়া আর বীরভূমের সাঁওতালরা শতকরা ৬০ ভাগ জমি বিক্রি করেছিল সামান্য ঋণের দায়ে , অত্যন্ত কম দামে । সব থেকে ভাল জমি সবথেকে আগে হাতছাড়া হয়েছিল । যদিও এরা এই অঞ্চলে সব থেকে আগে বসত গেড়েছিল । জঙ্গল হাসিল করেছিল , ফসল ফলিয়েছিল ।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়িক শ্রমে অর্জিত জমিকে পণ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছিল । দিকুদের চক্রান্তে ব্রিটিশদের কৌশলে বাংলাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল ঝাড়খন্ডী মানুষদের বহুধা বিভক্ত করার জন্য ।

জমি হারবার ফলেই ঝাড়খন্ডী মানুষেরা বৃহত্তর সস্তা শ্রমের বাজারে এসে পড়ে । ১৮৮০ সালের জঙ্গল আইন আদিবাসীদের জঙ্গলের অধিকার কেড়ে নেয় ।

১৯০৬ সালে মেদিনীপুরের সাঁওতালেরা রেভারেন্ড এ . এল . কেননান এর মাধ্যমে ভারত সরকারের কাছে একটা পিটিশন দাখিল করে । সেই পিটিশনে রেভারেনড এ . এল . কেননান আদিবাসী শ্রমিকদের একটা দুর্বিসহ জীবনের বিবরণ দেন ।

একদা দিকুদের কাছে ছোটনাগপুর মালভূমি ছিল Land of Tibet , দীর্ঘকাল শাসন ও নিস্পেষণে ছোটনাগপুর Land of Coolie –তে পরিণত হয় । ঝাড়খন্ডী মানুষদের সাথে যাঁরা দীর্ঘদিন সহাবস্থান করেছেন , যাঁরা ঝাড়খন্ডী মানুষদের সুখ-দুঃখের শরিক এবং একইভাবে জীবনযাপন করেন , যেমন - কামার , কুমোর , গোয়ালা , তাঁতি , পেঁড়ে , লোহার , মোমিন প্রভৃতি লোকেদের আদিবাসীরা দিকু বলেন না , দিকু তাদেরই বলা হয় যারা বহিরাগত , শোষক এবং প্রবঞ্চক ।

ভেরিয়ার এলউইনের মতে ১৯২১ সালের মধ্যে ২/৩ অংশ ঝাড়খন্ডী মানুষকে উৎখাত করা হয়েছিল – গিরমিট (Agreement) করে , চালান দেওয়া হয়েছিল নীল চাষ করতে , আসাম এবং উত্তর বঙ্গের চা বাগানে , মরিসাসে , ক্রেওলে কিংবা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে । যাদেরকে চালান দেওয়া হলো না তাদের আসতে হলো পরিযায়ী দেশানতরিত কৃষি শ্রমিক হিসাবে ।

নামাল কথার অর্থ পাহাড় নয় , নিচু অথবা সমতল জায়গা , সাঁওতালী ইয়া প্রত্যয় যোগে নামালিয়ী । ঝাড়খন্ডীদের যেটুকু অনুর্বর জমি ছিল সেটুকু প্রকৃতির দানে কোনরকমে রোপণ করে কিংবা বাড়ীতে বাড়তি লোকের হাতে ছেড়ে দিয়ে আষাঢ় - শ্রাবণে কিংবা ধান কাটার মরসুমে পিড়ি , পটলা , বাচ্চা-কাচ্চাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয় নামাল খাটতে । কষ্ট দিয়ে জীবন শুরু সমাপ্তি সেখানে ।

বাসাঝুর টুসু চিপলি টাকা লুভে নামাল চলিল ।

সিকি দিয়া রেলে চাপিল ।

আকুপর মাঠে বীচ ভাঙ্গিতে পারে নাই ।

রেগয়া লাতে জানে নাই ,

টুসু চিপলি হিড়ে বসি কাঁদি লাগিল ।

ঝাড়খন্ডী ছেলে-মেয়েদের এভাবেই শুরু হয় বেদিয়া জীবন । নামালিয়াদের ছেলে এভাবেই বড় হয় । রাস্তায় জীবন শুরু , শেষ হয় রাস্তাতেই । ধান লাগাবার কাজ মরশুম পড়লে আবার আসার পালা । আবার গান –

ঔডি ঝামাল কামি , হুগলি জিলা নামাল কৌমি

মুরেয়াক মনের মুদীম মসৎ এঞুরুক ।

জৌতিঞ উহীরতে জিউই চালাক

জিউই উইহীরতে জৌতি চালাক ।

অর্থাৎ ভীষণ ঝামেলার কাজ হুগলী জেলা নামালের কাজ , নাকের সখের নাকছাবিটিও খসে পড়ে । জাতের কথা ভাবতে গেলে জীবন চলে যায় , জীবনের কথা ভাবতে গেলে জাত হারায় ।

ঊনবিংশ শতাবদীর শেষের দিকে সুন্দরবন সাফাইয়ের কাজে ঝাড়খন্ডীদের সুন্দরবন অঞ্চলে নিয়ে আসা হয় । জঙ্গল সাফ করে নোনা জমিকে কৃষিযোগ্য করে তোলে । ড. নির্মলেন্দু দাসের মতে – সাঁওতালরাই সুন্দরবন অঞ্চলে কুলি হিসাবে প্রথম আসে । পরে গোসাবা , সাগরদ্বীপ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে । বাংলাদেশে সাঁওতালদের সর্বশেষ উপনিবেশ হচ্ছে সুন্দরবন অঞ্চলে । চবিবশ পরগণার সাঁওতালেরা প্রায় সব হাজারীবাগ থেকে এসেছে বলে গ্রীয়ারসন মনতব্য করেছেন ।সুন্দরবন এর সুন্দরী , গরাণের জঙ্গলে সুন্দরবনের বাঘ , বিদ্যাধরী , চূর্নী এবং মাতলা নদীর জলে কুমির এবং কামেটের বাস ।এদের সাথে লড়াই করে টিকে থেকে ঝাড়খন্ডীরা সুন্দরবন অঞ্চলকে আবাদী কৃষিযোগ্য করে তোলে । কিন্তু পরিণাম একই –

বন জঙ্গল কাটিকুটি

ভেড়িয়ানে দিসি মাটি

এই বনের মাটিরে হলাক খাঁটি

রে বুনুয়া জাতি ।

ভারতবর্ষের আদিবাসী মানুষদের জমির ইতিহাস , জিরেতের ইতিহাস , জীবনের ইতিহাস , জীবনধারা পরিবর্তনের ইতিহাস মানবিক এবং সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে আজও লেখা হলো না । আজও আদিবাসী এবং দেশজ মানুষকে সংস্কৃতায়ন এবং নির্বাকায়নের কানাগলিতে আনার সুকৌশল অপচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে ।

তথ্যসংগ্রহ মূলক বই সমূহ :-

১. সাঁওতাল স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস – বুদ্ধেশ্বর টুডু ।
২. খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি – রামদাস টুডু ।
৩. সংগ্র হ ও অনুবাদ – ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ।